BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03110033

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 11| November 2025| e-ISSN: 2584-1890

জেতোড়: ইতিহাসে অবহেলিত জনজাতি

Dr. Ajoy Kumar Mandal

SACT 1, History Department, Gourav Guin Memorial College, Paschim Medinipur, West Bengal

সারসংক্ষেপ:

কাসাই- সুবর্ণরেখা অববাহিকা বিস্তৃত অঞ্চলে জেতোড় জনগোষ্ঠীর প্রায় লক্ষাধিক মানুষ বসবাস করে। প্রচলিত আদমশুমারির বিবরণ এবং সরকার ঘোষিত জাতি ও উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর জাতির তালিকায় এদের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। বাংলার জনজাতির প্রকৃত ইতিহাসের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য, এদের জীবন ও সংস্কৃতির পর্যালোচনা একান্ত অনিবার্য। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে এই জাতির সম্পর্কে কেউই সেই ভাবে উল্লেখ করেননি কোন গ্রন্থে। এই জনগোষ্ঠীর মূল অবস্থান পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের কংসাবতী ও সুবর্ণরেখা নদীর অববাহিকা, যা মূলত পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলা। জেতোড় সমাজ মূলত মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। কিংবদন্তি অনুসারে হাজার হাজার বছর ধরে জাত হারিয়ে বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণে বা অবৈধ যৌন সংসর্গে জেতোড় জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। কৃষি কাজ এদের মূল অর্থনীতি। এছাড়াও বাড়ির মহিলারা জঙ্গলে জ্বালানি সংগ্রহের কাজে যুক্ত। তবে এদের সুনাম মূলত ধাত্রীবিদ্যায়। পুরুষেরা নদীতে মাছ ধরতে যায়, বালি খাদানে কাজ করে এবং ইট ভাটাতে ও কাজ করে। বংশগত ধারাবাহিকতায় এরা গান-বাজনাতে খুবই উৎসাহী। দৈহিক গঠন ও পোষাক পরিচ্ছদে আদিমতার ছাপ স্পষ্ট। এদের সামাজিক অবস্থান মূলত, মূল সমাজ জীবন থেকে বহু দূরে, স্থানগত বিচ্ছিন্নতা বা ভৌগোলিক দূরত্ব এবং সমাজের জাতি বর্ণগত ব্যবধান জনিত সামাজিক বিচ্ছিন্নতার প্রভাবে, জেতোড় জনজাতির জাতিগত প্রকৃতি এবং সংস্কৃতিক রূপ প্রকৃতপক্ষে প্রান্তীয় সংস্কৃতির বিশিষ্ট স্বরূপকেই প্রতিফলিত করে। বাংলার এই প্রাচীন প্রান্তিক জনজাতি বাংলার বৃহৎ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিচ্যুত কেন? আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে এদের বৃহত্তর আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে বৈপরিত্য আদিম ধারা অনুসরণে বাধ্য করেছে? এসকল উদ্ভূত প্রশ্নাবলীর তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা এই প্রবন্ধে অবতারণা করার প্রয়াস।

মূল শব্দ: *জেতোড়, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা, নরতা, হাতিমানা ডোম, বাউরি, করমডাল, সুশীল সমাজ।*

মূল আলোচনা:

এই জনগোষ্ঠীর মূল অবস্থান প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডক্টর তুষার চট্টোপাধ্যায় বলেন,[১] 'The narrative has been created through oral tradition with reference to the Jetor, an ethnic group of the western border areas of west Bengal'. পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তে কংসাবতী ও সুবর্ণরেখা নদীর অববাহিকা অর্থ্যাৎ পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। জেতোড় সমাজ মূলত মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। কিংবদন্তি অনুসারে হাজার হাজার বছর ধরে জাত হারিয়ে বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণে জেতোড় জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। কৃষি কাজ এদের মূল অর্থনীতি।

জেতোড় সমাজের মানুষের সামাজিক ইতিহাস জানতে গেলে আমাদের, তাদের নানান ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, মন্ত্র, লোক কথা, লোক সংগীত, প্রেম সম্পর্কিত সংগীত, ধর্ম ও উৎসব সম্পর্কিত সংগীত, সমাজ জীবন সম্পর্কিত সংগীত, সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এর মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের নানান সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের ইতিহাস। জেতোড় জনজীবনের ধারা ও

সাংস্কৃতিক পরিক্রমায় দেখা যায় যে, সামগ্রিকভাবে ঝারিখন্ড ভূমি বা জঙ্গলমহলে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও আধুনিকতার প্রভাবে সাম্প্রতিককালে যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার প্রভাব স্পষ্ট। তবে জেতোড় জনগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান যে এই সকল অঞ্চল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তারা উচ্চ বর্ণের মানুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করার ফলে, উচ্চ বর্ণের নানান সংস্কৃতি নিজেদের সংস্কৃতি বলয়ে নিজেদের অজান্তে গ্রহণ করে ফেলেছে। যেমন গরাম, ছাতা পরব, চরক গাজন, শীতলা পূজা, বাঁধনা পরব, ভীমপূজা, প্রভৃতি উৎসব পার্বণ কেও নিজেদের সংস্কৃতি বলয়ে স্থান দিয়েছে।

ছোট বড় ও স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ না করলে কোন জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা অসম্ভব। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, জেতোড় রা মূলত পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গে, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের জনগোষ্ঠী। প্রচলিত আদমশুমারির বিবরণ এবং সরকার ঘোষিত জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর জাতির তালিকায় এদের কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে এদের জাতিগত ও সংস্কৃতিগত পরিচয় প্রকট। মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম-প্রান্তস্থ বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্ত সংলগ্ন কাঁসাই ও সুবর্ণরেখার তীরবর্তী অঞ্চলেই জেতোড় জনগোষ্ঠীর বিস্তার পরিলক্ষিত হয়। একসময় এই সকল অঞ্চলে যে সুপ্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তা দীর্ঘ নৃতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রমাণিত সত্য।

ড: আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় তা থেকে জানতে পারা যায় যে, যীশুখ্রিস্টের জন্মের পূর্বেই যখন মেদিনীপুর জেলার তাম্রলিপ্ত একটি সমৃদ্ধ সমুদ্র বন্দর ছিল, তখন পশ্চিম সীমান্ত বাংলার পার্বত্য ও অরন্যাকীর্ণ অঞ্চল সর্বদা নদনদী ও অসংখ্য শাখা প্রশাখা দ্বারা বিধৌত হত। এই সকল নদ নদীর নাম সুবর্ণরেখা, কাসাই, রূপনারায়ণ, দামোদর, ইত্যাদি।[২] এই সকল অঞ্চল ছিল এক সময়কার সাঁওতাল, মুন্ডা, কোলদের বিচরণ ক্ষেত্র। লোককথায় এদের উদ্ভব প্রসঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণ বা অবৈধ যৌন সংসর্গের তত্ত্ব বলা হয়েছে। যেসব মানুষের অবৈধ সংসর্গে জেতোড় জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিকাশ তারা হলেন, বিত্তশালী রাজা, জমিদার, গোমস্তা, রাজকর্মচারী, বহিরাগত বর্গী, প্রভৃতি। এদের দৈহিক আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে সাধারণভাবে সংমিশৃত রূপ পরিলক্ষিত হয়। এরা সভ্য সমাজ থেকে আজও সামাজিক ও মানসিক দূরত্বে সহাবস্থান করে। জেতোড় সমাজ মূলত মাতৃতান্ত্রিক। এদের সমাজে নারীদেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এদের অর্থনীতি মূলত কৃষি ও মজুরভিত্তিক। এরা মূলত গরু, ছাগল, মহিষ, ইত্যাদি পশু কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত। জ্বালানি সংগ্রহ, নদীতে মাছ ধরা, বালি খাদানে ও ইটভাটাতে শ্রমিকের কাজ এদের পেশা। বংশগত ধারাবাহিকতায় এরা গান-বাজনাতেও খুবই উৎসাহী। এখনো প্রতিটি জেতোড় পাড়াতে বাজনার দল চোখে পড়ে। পান্তা ভাত এদের অন্যতম প্রধান খাদ্য। হাড়িয়া এদের উৎসব কেন্দ্রিক পানীয়। এখনো এরা মরা পশু পাখির মাংস তৃপ্তি সহকারে রান্না করে।[৩]

নিজেদের উৎসব পার্বণে সাধারনত এরা নিজেরাই পৌরহিত্য করে। তবে দীর্ঘদিন বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে বসবাস করার ফলে, ভিন্ন জাতির উৎসব কেন্দ্রিক সংস্কৃতি আত্মস্থ করে ফেলেছে, বা নিজেদের সংস্কৃতি বলয়ে স্থান দিয়েছে। যেমন গরাম,ঈদ করম, ছাতা পরব, চড়ক-গাজন, শীতলা বাঁধনা, ভীম পূজা, ইত্যাদি। তবে, এদের একেবারে নিজস্ব কতগুলো পারিবারিক উৎসব পার্বন ও রয়েছে। হাতিমানা, মনসা, নলগাড়া, টুসু, এগুলি এরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে।[৪] তবে খালশিউলি ও ঝাড়গ্রামের কয়েকটি জেতর গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখেছি, রাঙাহারী ও বিশুইচন্ডী নামে দুই লোক দেবীর পূজা এরা করে থাকেন। যা এই দুই জেলায় সচরাচর চোখে পড়ে না। জেতোড় রা আমোদ প্রিয় জাতি। এরা এদের উৎসব পালন কে কেন্দ্র করে নানান সাহিত্য রচনা করে থাকে। তবে সেই সকল সাহিত্য লিখিত আকারে চোখে পড়েনি। গ্রামের মুরুব্বিরা বা লোকশিল্পীরা খাতায় লিখে রেখেছে নানান ছড়া, মন্ত্র, লোককথা, লোক সংগীত।[৫] জেতোড় রা তাদের সামাজিক নানান উৎসবে এগুলি সমবেতভাবে পাঠ করে। এদের সংগীত গুলি হল সহজ সরল ভাষায় লেখা। যেগুলি সাধারণত কর্ম সম্পর্কিত সংগীত, প্রেম সম্পর্কিত সংগীত, ধর্ম ও উৎসব সম্পর্কিত সংগীত ও সমাজ জীবন সম্পর্কিত সংগীত।

জেতোড় জনগোষ্ঠীর ওপর, পশ্চিমাংশের মাহাতো জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় যে সকল কুর্মী মাহাতোরা বসবাস করেন, তাদের ভাষা কুর্মালি ভাষা। জেতোড়দের ভাষা ও কুরমালি ভাষা। এই সকল কুর্মী মাহাতোদের প্রসঙ্গে ড: বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতো বলেন, মুন্ডা ও কুরমিরা সমসাময়িক কালে ঝাড়খন্ডে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। প্রাচীনকালে মগধে চেরপাদ নামক উপজাতি বাস করত, তারাই পরবর্তীকালে ঝাড়খন্ডে এসে মুন্ডা এবং কুর্মী নামে দুটি উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে যায়[৬] শরণাতীত কাল থেকেই ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় কুর্মি মাহাতোদের বিরাট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এদের প্রভাব ও রক্তের সংমিশ্রণে সম্ভবত এই সকল অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে জেতোড় জনগোষ্ঠীর। ডক্টর

নির্মলেন্দু দে তার জেতোড় গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, যে সকল অঞ্চলে জেতোড় দের বসবাস, সেই সব অঞ্চলের মধ্যে কাসাই অববাহিকা তেই জেতোড় দের অবস্থান আদি এবং সংখ্যায় অধিক।[৭] যা ক্ষেত্রসমীক্ষায়ও জানা গেছে কাসাই অববাহিকা অঞ্চলে স্থানীয় মানুষদের মুখে মুখে এখনো একটি বহুল প্রচলিত ছড়া শুনতে পাওয়া যায় -

"যার নেই জাত কুল

সে যায় কাসাই কুল।"[৮]

এই প্রচলিত ছড়া থেকে অনুমান করা যায় যে, একসময় জাত কুলহীন লোকেরা কাসাই অববাহিকা অঞ্চলে বসবাস করত। এরাই জেতোড় নামে পরিচিত। স্থান বিশেষে জেতোড় রা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন, কাওরা, কাউরা, ডোম, কালিন্দি ডোম, ডাঙ্গী, হাড়ি, মাহার, কৈবর্ত জেলে, ইত্যাদি।

অন্যান্য উপজাতি গুলোর মত, জেতোড় সমাজেও নারীদের প্রাধান্য বেশি চোখে পড়ে। পারিবারিক নানান ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। জেতোড় পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত অলস। সামাজিক এবং সাংসারিক বিষয়ে মহিলাদের কথাই প্রাধান্য পায়। এরা বাড়িতে নানান প্রকার পশু পাখি পালন করে। এদের ঘরবাড়ি সাধারণত খড়ের তৈরি। বাড়ির গৃহপালিত গরু মহিষ কে এরা পূজা করে। বাঁধনা পরবে নাচের সময়।[৯] উল্লেখ্য এই জনজাতি কেবল সামাজিক মান মর্যাদার দিক থেকে তারা যে নিম্নতম স্তরে তা নয়, অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকেও এই জনগোষ্ঠী চরম দুর্দশা গ্রস্থ। এদের অর্থনৈতিক জীবন মূলত আবর্তিত হয়, নানান প্রকার আর্থিক অনুদান, পতীত জমি উদ্ধার, কৃষি কাজ, দিনমজুর খাটা, নানান প্রকার হাতের কাজ, কলকারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ, ইট ভাটায় কাজ, পশু পালন, গীত বাদ্যচর্চা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মেয়েদের ধাইয়ের কাজ, ছোট ছেলেমেয়েদের বাগাল খাটা ইত্যাদি। এরা একসময় জন্মসূত্রের সহানুভূতি ও ক্ষমতার ফলে, গান বাজনায় সন্তুষ্ট করে, ধাইয়ের কাজ করে বা কোন বিশেষ কর্মে পারদর্শিতার দ্বারা উচ্চবর্ণের রাজা জমিদার শাসক গোষ্ঠীর নিকট থেকে প্রচুর জমি জমা লাভ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত।[১০]

বর্তমানে এস সি, এস টি, ওবিসি, তালিকাভুক্ত না হওয়ার কারণে, নানান প্রকার সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকেও এরা বঞ্চিত। এদের একটা বেশিরভাগ অংশের চাষী ভাগ চাষী হিসেবে, বিত্তবানদের জমি ভাগে চাষ করত। কিন্তু অতি সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে তারা আর এদেরকে জমি ভাগে চাষ করতে দিচ্ছেন না। (ভাগ চাষ বা বর্গা আইনের ভয়ে) পূর্বেই উল্লেখ করেছি জেতোড়রা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেই বসবাস করে। কাসাই নদীর তীরে বহু বালি খাদান এবং ইট ভাটা চোখে পড়ে। বহু জেতোড় নারী ও পুরুষ কে ইটভাটাতে কাজ করতে দেখা যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখেছি,কাসাই নদীর তীরের একটি ইটভাটাতে ১৪৭ জন জেতোড় মহিলা ও পুরুষকে বাস করতে। তারা শিশুদেরকে নিয়ে ইট ভাটার মালিকের তত্ত্বাবধানে ওখানে বসবাস করে। ইট ভাটার যাবতীয় কাজ, ওরা করে থাকে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খালশিউলি গ্রামের জেতোড় মহিলাকে নানান প্রকার হাতের কাজ করতে দেখেছি। শালপাতার থালা প্লেট বাটি প্রভৃতি তৈরি করে তারা শহরে বিক্রি করে। তারা বাঁশের নানান প্রকার দ্রব্য, খেজুর পাতার নানান প্রকার দ্রব্য, তাল পাতার নানান প্রকার দ্রব্য, বাবুই ঘাস থেকে তৈরি করা দড়ি, ইত্যাদি। প্রবীণ এক জেতোড় বৃদ্ধ র সাক্ষাৎকার নিয়ে জানতে পারলাম,[১১] একসময় ঝাড়গ্রাম, লালগড়, রামগড়, প্রভৃতি রাজ সভায় জেতোর দের গায়ক ও বাদকরা ধারাবাহিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। এখন সেসব কেবলই অতীত। কোনরকম টিকে আছে তাদের প্রাচীন এই পেশা। জেতোড় বৃদ্ধ আরো বলেন, জেতোড় মায়েরা ধাত্রী বিদ্যায় অধিক পারদর্শিনী ছিলেন। এই সুবাদে এরা যেমন উচ্চবর্ণের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতেন তেমনি, তাদের অর্থ উপার্জন হত। তবে বর্তমানে চিকিৎসা ব্যবস্থার অধিক উন্নতির কারণে, অধুনা জেতোড় মায়েদের এই পেশা লুপ্ত হতে বসেছে। জেতোড় পরিবারের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের অবস্থা আরও সঙ্গীন, ৮/১০ বছর বয়স থেকেই তারা লোকের বাড়িতে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হয়ে যায়, অল্প কিছু টাকার বিনিময়ে। আবার এমন বেশ কিছু গরিব জেতোড় পরিবার রয়েছে যারা তাদের বাড়ির ছেলে মেয়েদেরকে, বার্ষিক চুক্তিতে শহরের ধনী পরিবারে রেখে আসে।[১২]

প্রায় সকল জেতোড় পরিবারে, মুরগি ছাগল ভেড়া, পালন করা হয়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর ওইগুলোকে তারা বিক্রি করে দেয়। তবে এরা খুবই পরিশ্রমী। বিশেষ করে জেতোড় মেয়েরা। জেতোড় জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানারূপ আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন রয়েছে। এই সমাজ এখনো কুসংস্কার আচ্ছন্ন। সাধারণভাবে অন্যান্য উপজাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে এদের আচার অনুষ্ঠানের স্বতন্ত্র চোখে

পড়ে। জেতোড় নারীরা অন্তঃসত্তা হলে, এরা কোনরূপ প্রাণী হত্যা করে না। এরা মাছ মাংস খাওয়াও বন্ধ করে দেয়। ওই সময় অনেকে বড়াম থানে ছাগল, মুরগি বলি দেওয়ার মানসিক করে। সন্ধ্যায় এদের বাড়ির বাইরে বেরোনো নিষেধ করে দেয় মুরুব্বিরা। এরা ওই সময়, মন্ত্রপূত নানান তাবিজ ধারণ করে যাতে, গর্ভের সন্তান সুস্থ ভাবে পৃথিবীর আলো দেখতে পারে। খুব কম সংখ্যক জেতোড় সন্তানসম্ভবা মহিলারা ডাক্তারখানায় যায়। এরা ওই সময়ে নানান প্রকার তুক তাক, গাছ গাছড়ার ঔষধাদি সেবন করে। সন্তান প্রসবের সময় নিজেদের ধাত্রী মায়েরাই তা সম্পন্ন করে।[১৩] ভাবতে অবাক লাগে যে বর্তমান দিনে চিকিৎসা ব্যবস্থার এতটা উন্নতি সত্ত্বেও, এখনো জেতোড় রমণীরা ধাই মায়ের উপর বেশি নির্ভরশীল। আশি বছরের উর্ধ এক ধাই মা'র সাক্ষাৎকারের সারবস্তু এইরকম –" আমি এই গ্রামের প্রায় ১১৬ টি বাচ্চার জন্মের সময় উপস্থিত ছিলাম ধাইমা হিসাবে। আজ অবধী একটাও বাচ্চা নষ্ট হয়নি, বরং আমার কথা না শুনে কানু মাহার তার পোয়াতি বউকে নিয়ে সরকারি হসপিটালে গিয়েছিল, বাচ্চার জন্মের সময় বউটা মরে গেল"।[১৪] ধাইমা জন্মের পর নবজাতকের নাভি ছেদন করে। সন্তান জন্মের নয় দিনের মাথায় ধাই মায়ের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান হয়। যা নরতা নামে পরিচিত। এই দিন নবজাতকের নাম ঠিক করা হয়। জেতোড় কুমারীদের যৌবনপ্রাপ্তির সময়ে কতগুলো আচার পালিত হয়। ঐদিন তাদের ২৪ ঘন্টা অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়। ঋতু সঞ্চার না হলে বধুকে এরা যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে করে না। জেতোড় সমাজে আজও বাল্যবিবাহ প্রচলিত রয়েছে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন রীতির অনুষ্ঠান চোখে পড়ে জেতোড় সমাজে। যতদিন না পর্যন্ত বিবাহিত জেতোড় কন্যার ঋতু সঞ্চার হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত ওই মেয়েকে স্বামীর শোবার ঘরে পাঠানো হয় না। গ্রামের মুরুব্বিরা ঋতু সঞ্চার হওয়ার ঠিক ১৬ দিনের মাথায় স্বামীর সয়ন কক্ষে মেয়েকে পাঠায়।[১৫] ঐদিন তারা একটি আচার পালন করে। ঘি সহযোগে হোম করে, হোমের নির্দিষ্ট কোন মন্ত্র নেই। বহু জেতোর মহিলা একাধিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সেই উদাহরণ অনেক রয়েছে।

জেতোড় সমাজে মূলত তিন ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলন রয়েছে। প্রথমত বিটি বিবাহ বা বাল্যবিবাহ। এক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই মেয়েকে বিবাহ দেওয়া হয়। জেতোড় সমাজে এই বাল্যবিবাহের বহু নজির রয়েছে। ১৯৯০ সালে দৈনিক সংবাদপত্র আজকাল এর একটি খবর থেকে তা স্পষ্ট। " অগ্নি সাক্ষী রেখে ১২ বছরের গঙ্গা ঘোরাই ১৬ বছরের শংকর মাহারের গলায় মালা পরালো। বিয়েতে শংকর বর পনে নিয়েছে ২৫০ টাকা। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। কংসাবতী নদীর তীরে আমদই গ্রামে। গত ১৪ ই জুলাই। আমদই এলাকার অঞ্চল প্রধান এবং সব থেকে কাছের পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার কে পাওয়া যায়নি। স্থানীয় অনেক মানুষের সঙ্গে কথা বলে মনে হল, এটা যে বেআইনি কাজ এমন কোন ধারনাই তাদের নেই। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ কর্মী জানালেন এই বাল্যবিবাহের খবর তারা পান ১৮ই জুলাই।[১৬] তবে অধুনা এই ঘটনা অনেকটা কমেছে। দ্বিতীয় বিবাহের নাম হল সাঙ্গা বিহা। জেতোড় সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। স্বামীর মৃত্যুর পর, পর পুরুষের সঙ্গে সংসার করা জেতোড় সমাজের স্বাভাবিক ঘটনা। তৃতীয় বিবাহের নাম ধরাবাধা বিহা। বিবাহ বিচ্ছিন্ন ছেলে এবং মেয়েরা যদি অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয় এবং তা যদি গ্রামের মাতব্বর দের দৃষ্টিগোচরে আসে তখন মাতব্বররা তাদেরকে জোর করে বিয়ে করিয়ে দেয়। তবে জেতোড় সমাজে যে বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তা অনেকটা হিন্দু সমাজের বিবাহ পদ্ধতির সঙ্গে মিলে যায়। এদের বিবাহ অনুষ্ঠানের কতগুলি স্তর হলো, ছেলে মেয়ে দেখাশোনা,নিমন্ত্রণ,আবরা ভাত, আদ্য শ্রাদ্ধ, হস্ত বন্ধন, সিঁদুর দান, সুপারি ভাঙা, কন্যা বিদায়, কাদা-খেলি দিন-বাধা ও পন ভাঙ্গা, গায়ে হলুদ, জল সাদামাটি আনা, ঘট আনা, বরযাত্রী ভোজন, বাধা পোনা, করি খেলা ইত্যাদি।

জেতোড় সমাজে প্রচলিত পালা পার্বণগুলিকে কতগুলি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত এরা বেশ কিছু উৎসব পার্বণ বহিরাগত রূপে যোগদান করে, যেমন করম ঈদ বা ছাতা পরব ইত্যাদি। আবার বেশ কিছু উৎসব এরা অঞ্চলগত বা সার্বজনীনভাবে প্রতি পালন করে। যেমন চরক গাজন, শীতলা, বাঁধনা, জাতাল, ভীম পূজা, ইত্যাদি। আবার এদের বেশ কিছু পারিবারিক বা গৃহগত অনুষ্ঠান রয়েছে যেমন, হাতি মানা, মনসা, নলগাড়া, টুসু,ইত্যাদি। থান বিশেষে ও এরা বেশ কিছু উৎসব পালন করে থাকে, যেমন ভাদু, যাওয়া উৎসব, ইত্যাদি। আবার এদের বেশ কিছু নিজস্ব দেব-দেবী গোষ্ঠীগত রূপে বা সার্বজনীনভাবে পূজিত হয়, বড়াম গড়াম,সাত বুড়ি, ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে ভাইফোঁটা জামাইষষ্ঠী, অম্বুবাচী ইত্যাদি।[১৭] সরাসরি হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু শাক্ত দেব-দেবীর উৎসব পার্বণেও এরা যোগদান করে। যেমন কালী পূজা, দুর্গা পূজা, সরস্বতী পূজা ইত্যাদি। তবে এই সকল শাক্ত দেব-দেবী কেন্দ্রিক উৎসব পার্বণে এদের সরাসরি অংশগ্রহণ চোখে পড়ে না।

আমরা যদি জেতোড় দের উৎসব পার্বণ গুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করি, তবে তাদের সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হব। ভেতরদের স্থায়ী মন্দির খুব কম রয়েছে। জেতোড় যুবক-যুবতীরা ধর্ম ঠাকুর বা ধর্মরাজের ব্রত করে থাকেন। সকল রাঢ় বাংলার জনপদ সমাজে গ্রাম্য লৌকিক দেবতাদের মধ্যে ধর্মরাজ অন্যতম। L S S O'Malley বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার বীরভূম এ লিখেছেন যে-"Dharmaraj is usually worshipped by a low cast priest".[১৮] জেতোড় জনগোষ্ঠীর অপর প্রিয় উৎসব হল শিবের গাজন। জেতোড় রা বছরে তিনবার গাজন উৎসবে অংশ নেয়।, চৈত্র সংক্রান্তির গাজন, বৈশাখী গাজন, ও জৈষ্ঠ মাসের গাজন। তবে এদের কাছে চৈত্র সংক্রান্তির গাজনই মূলত শিবের গাজন। বৈশাখ সংক্রান্তির ও জ্যৈষ্ঠের গাজন হল ধর্মরাজের গাজন। S P Agrawal, বলেন, "In West Bengal, Sivaratri has became almost a folk festival"[১৯] গাজন জেতোড় সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব। জেতোড় মহিলারা তাদের ভালো স্বামী পাওয়ার উদ্দেশ্যে গাজনে অংশ নেয়। জেতোড় কৃষক সমাজ মূলত দুটি উদ্দেশ্যে শিবকে পূজা করে চলেছেন। সন্তান কামনায় এবং ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি কামনায়। T.W. Clark, তাঁর আর্টিকেল এ বলেন, বাংলার কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী অধিকাংশ লোক এই শৈব উৎসবের ধারক ও বাহক।[২০]

মনসা দেবীর পূজা ও জেতোর দের অন্যতম উৎসব।LSS O' Mally তার বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, বীরভূম, এ বলেন যে,[২১] বাগদী বা ডোম নয় বাউরি মাল ভূমি যোগ ভূঁইয়া এবং মাহাতো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা মনসা পূজা করে থাকেন। ঝাড়গ্রাম গোপীল্লভপুর সাঁকরাইল নয়াগ্রাম ও জামবনি থানা তে বহু জেতোড় পরিবার মহাসমারোহে মনসা পূজায় অংশ নেয়। মনসা জেতোর জনগোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাসের এক বিশিষ্ট অঙ্গ। অনেক জেতোড় পরিবারে পারিবারিক দেবী হিসাবে মনসা অধিষ্ঠান করেন। প্রায় প্রতিটি জেতোড় পরিবারে একটি করে মনসা গাছ রয়েছে। এখনো বহু জেতোড় পরিবারে গুনিন চোখে পড়ে। যারা গ্রাম্য বৈদ্যির ভূমিকা পালন করে। জেতোড় অধ্যুষিত অঞ্চলের এক গুরুত্বপূর্ণ পরব হলো করম। কাসাই ও সুবর্ণরেখা অববাহিকায় এই উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়।জেতোড় এলাকায় জনগণ করমকে ধরম বা ধর্ম ঠাকুরের ভাই বলে মনে করে। এদিন জেতোরগণ ঢোল মাদল বাজিয়ে সন্ধ্যার আগে জঙ্গল থেকে করমডাল ভেঙ্গে মাথায় করে নিয়ে আসে। রাতে এরা করম ঠাকুরের পূজা করে। সারারাত ধরে করম পূজাকে কেন্দ্র করে এরা নানান প্রকার ছড়া কাটে। যেমন-

"আজরে করম রাজা ঘরের দুয়ারে
কালরে করম রাজা কাঁসাই নদীর পারে"[২২]

সারারাত ধরে হেঁড়িয়া সেবন করে, এদের নিজস্ব বাজনা দল গান করে। জেতোড় রা সাধারণত করম উৎসব করে থাকে অত্যাধিক শস্য উৎপাদনের কামনায়। এবং জেতোড় সমাজের কুমারী মেয়েরা এই ব্রত পালন করে তার কারণ হলো, ভবিষ্যৎ সন্তান কামনায়। জেতোড় সমাজের অপর গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হল ইঁদ উৎসব। এই উৎসবে জেতোড়রা সরাসরি অংশ নেয় না। ড: বিনয় মাহাতো তার লোকায়ত ঝাড়খন্ড গ্রন্থে বলেন যে -

"বাংলাদেশের ঈঁদ পূজার সর্বাপেক্ষা ঘটা হয় মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে ও বাঁকুড়ায় বিষ্ণুপুর রাজার বাড়িতে'।[২৩] বিরাট শাল গাছের উপর একটি বাঁশের ছাতাকে নতুন কাপড় ও নানা ফুলে সুসজ্জিত করা হয়। তারপর বাকিরা সবাই শাল দন্ডটিকে দাঁড় করিয়ে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। ওই ছাতার ওপর খৈ দই ঢালা হয়। খালশিউলি ও ধারেনদা গ্রামের জে তোড় জনগণেরা গ্রামীন জেতোড় জনগণেরা তাদের গৃহপালিত পাঠা বলি দেয়। সুশস্য কামনার উদ্দেশ্য। এই উৎসবকে নিয়ে জেতোড় জনসমাজের মধ্যে তাদের নিজস্ব গান রয়েছে।

"ঝাড় গাঁর গড়ে, মগনে মগনে হাতি চলে।
যখন উঠে ইঁদটি তখন ভাঙ্গে ঘুমটি,
মন আমার উই ড়ে- উই ড়ে চলে।
জনার ফুটে ফাটফুট
মা বেটি কুড়া কুট
জামাই আইলো ভাদোর মাসে।
খড় খইসা জামাই আইলো নিতে।

আগুর দিকে ঝাঁটা ঠেঙ্গা
পিছুরদিকে পুটলি বাধা।
জামাই ভালা বটে বিটি তুই হেতু বদমাই শ-লে।”[২৪]

গানটির মধ্য দিয়ে জেতোড় সমাজে সামাজিক ও পারিবারিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

জেতোড় দের বৈষয়িক ও আত্মিক বা সাত্ত্বিক জীবন ধারণগত সমস্যা খুবই প্রকট। এদের মধ্যে এখনো শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, বেগার খাটা, কুসংস্কার,ওঝা ও গুনিন প্রথা বহাল রয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর এদেশে বেশ কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে। দেশে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এসেছে অনেক। তথাপিও এই সকল জাতি গোষ্ঠীর জীবনে কোন পরিবর্তন আসেনি। জেলা গত ও রাজ্যগত প্রেক্ষিতে এরা আজও উপেক্ষিত, অবহেলিত, মানুষের বেঁচে থাকার যে প্রাথমিক প্রয়োজন খাদ্য পানীয় বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এগুলো থেকে এরা বঞ্চিত। জল জমি জঙ্গলের সঙ্গে এদের বহুদিনের আত্মিক সম্পর্ক। কিন্তু বর্তমানে উন্নয়নের নামে শিল্পায়নের নামে জনজাগরণের নামে নগরায়নের নামে এদের প্রাথমিক অধিকার থেকে এদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সমাজের ভিত্তি ও কৃষ্টি থেকে এরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে গ্রাম্য পঞ্চায়েত প্রধানদের উদ্যোগ নিতে হবে। উল্লেখ্য আজকে এদের মানবিক মর্যাদা কে খাটো করে দেখা হচ্ছে। এরা অস্পৃশ্যতার অমানবিক সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত। প্রথমে এদের এই অস্পৃষ্টতা থেকে মুক্ত করতে হবে। এরা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করার ফলে, চরমভাবে অর্থনৈতিক ভারসাম্য হীনতায় ভুগছে। জেতোড় সম্প্রদায়ের যুবক যুবতীরা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তাদের কাছে একটা ব্যাধির আকার ধারণ করেছে। সরকারি স্বতন্ত্র স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে, এদের নিজস্ব জাতিগত যে স্বতন্ত্রতা তা তারা হারাচ্ছে। যেমন কলাইকুন্ডা তে যে সকল জেতোড় রা আজও বসবাস করছে, তাদের বেশ কয়েকজন ডোম সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। আবার গোপীবল্লভপুর এর তপসিয়া গ্রামে যে কয়েকটি জেতোড় পরিবারের বসবাস তারা মাহার জাতি হিসেবে সরকারি সাহায্য পাচ্ছে।

আমরা যদি প্রকৃত মন থেকে এই সকল বিস্তৃত প্রায় জনগোষ্ঠীগুলির সমস্যা দূর করতে চাই তাহলে প্রথমে ভোগের রাজনীতির খোলস থেকে বেরিয়ে এসে ত্যাগের রাজনীতি, আদর্শের রাজনীতি, মূল্যবোধের রাজনীতিকে সর্বাগ্রে আনতে হবে। নির্বাচন সর্বস্ব রাজনীতি বা ভোটবাজার ভিত্তিক রাজনীতি পরিত্যাগ করতে হবে। গণ সংযুক্তি প্রবণ লোকায়ত রাজনীতির জোয়ার আনতে হবে। জনবিচ্ছিন্নতা খারিজ করে অভ্যুত্থানের উপর জোর দিতে হবে। নিম্নবর্গের সাধারণ আমজনতার বস্তু জাগতিক ও মনোজাগতিক ক্ষেত্রে সর্বাত্মক গুরুত্ব দিতে হবে। কেবল সরকারি উদ্যোগ নয় সুশীল সমাজকে (Civil society) কে এগিয়ে আসতে হবে। কেবল নিম্ন জাতের অগ্রগতি নয় নিম্ন শ্রেণীর প্রগতি সমৃদ্ধি ও উন্নতির দিকেও সুনজর দিতে হবে। তাদের যুবসমাজের কাজের অধিকার কে মৌলিক অধিকার হিসেবে সুনিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে লোকমুখী বা জনবাদী ও নবজনবাদী পঞ্চায়েতি ব্যবস্থাকে সুস্থ ও নিরপেক্ষভাবে কাজে লাগাতে হবে। সম্প্রতি কেউ কেউ বলেন “ইতিহাস ফুরিয়ে গেছে মতাদর্শের অবসান হয়েছে” আমার মনে হয় এই সকল দলিত শ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাস এখনো ফুরিয়ে যায়নি। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও আদর্শ সমকালীন প্রেক্ষিতে আজও প্রাসঙ্গিক এবং আগামীদিনেও প্রাসঙ্গিক থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১. Chattopadhyay Tushar, -Jetor: Ethniclore and Ethno Cultural context, xi Congress of the International Society for folk narrative Research(ISFNR) Mysore, India, January, 6.12. 1995.

২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-১।

৩. সাক্ষাৎকার: মাহাতো সরোজ, বয়স ৪৩। পুরুষ, হিন্দু, বালিভাষা, ঝাড়গ্রাম। অধ্যাপক, গৌরবগুইন মেমোরিয়াল কলেজ।১০-১০-২০২৪। সকাল ১০ঃ৩৫ মিনিট।

৪. সাক্ষাৎকার: আচার্য ঝরনা, বয়স ৫২। মহিলা। হিন্দু। লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষিকা। বিনন্দপুর। মেদিনীপুর পশ্চিম। ১০-৬-২০২৫। দুপুর ১২:২০ মিনিট।

৫. সাক্ষাৎকার: দে মধুপ, বয়স ৬৭। হিন্দু। ঝাড়গ্রাম,পশ্চিম মেদিনীপুর। প্রাক্তন প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শক ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষক। ১০-৬ ২০২৫। ১১ঃ৫০ মিনিট।

৬. মাহাতো বঙ্কিমচন্দ্র, ঝাড়খণ্ডের লোক সাহিত্য। কলকাতা। ১৯৮৪। পৃষ্ঠা ২৪।

৭. দে নির্মলেন্দু, জঙ্গলমহলের অজ্ঞাত অন্ত্যজ জেতোড়, নির্মলেন্দু দে। মেদিনীপুর। ২০১৭, পৃষ্ঠা ৩৭।

৮. ঐ।

৯. সাক্ষাৎকার: দে মধুপ।

১০. সাক্ষাৎকার: দে মধুপ।

১১. সাক্ষাৎকার: মাহার দিনু, পুরুষ, ৬২ বছর, ধোবাসোল, রোহিনী, ১০ ই জানুয়ারি ২০২৪। সকাল ১০ টা।

১২. সাক্ষাৎকার: বাটুল সরলা, মহিলা, বয়স ৭২, খাল শিউলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১২ ই জানুয়ারি ২০২৪। সকাল ১১:৪০ মিনিট।

১৩. সাক্ষাৎকার: মাহার কৃষ্ণচন্দ্র, পুরুষ, বয়স ৭১, গোপালউড়া, বেলিয়াবেড়া, ঝাড়গ্রাম, ৮ ই মে ২০২৫। সকাল ১০ টা।

১৪. সাক্ষাৎকার: মাহার মালতি, মহিলা, বয়স ৭০, খালশিউলি,ঝাড়গ্রাম, ৯ই মে ২০২৫। সকাল ১০ টা।

১৫. সাক্ষাৎকার, ঐ।

১৬. দৈনিক সংবাদপত্র আজকাল, জেতোড় সমাজের বাল্যবিবাহ প্রথা। ২২ এ জুলাই ১৯৯০।

১৭. দে নির্মলেন্দু, প্রাগুপ্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৫৩।

১৮. L.S.S. O'Malley, Bengal District Gazetteers, Birbhum, The Bengal Secretariat Book Deptt. Calcutta,1910, p.33.

১৯. Agrawal. S. P, Festivals National -International the derector, publications Division, ministry of information and Broadcasting, govt. Of India. Faridabad1956, p,17.

২০. T. W. Clark, Evolution of Hinduism in Medieval Bengali Literature:Siva, Chandi, Manasa, Vol -17, no-3,1955, published by, Bulletion of the School of oriental African studies: University of Hinduism, Cambridge University press, p-505.

২১. L.S.S. O'Malley, opp. cit., P-33.

২২. নির্মলেন্দু দে, পূর্বক্ত গ্রন্থ পৃষ্ঠা, ৩৭।

২৩. বিনয় মাহাত, লোকায়ত ঝাড়খন্ড,পৃ- ৪৫।

২৪. নির্মলেন্দু দে,পূর্বোক্ত,পৃ- ৩৭।

Citation: Mandal. Dr. A. K., (2025) "জেতোড়: ইতিহাসে অবহেলিত জনজাতি", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-11, November-2025.